গান্ধী আলোয় প্রকৃতি

সুপ্রিয় মুন্সী

শিল্প বিপ্লবের কালকে অতিক্রম করে বর্তমান মানব সভ্যতা প্রযুক্তি বিপ্লব সংঘটনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলির দাবী তারা ইতিমধ্যেই এটি সাধন করেছে এবং উন্নতিশীল দেশগুলি এটিকে তাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য বলে ধার্য করেছে। জীবন-যাত্রার চরম ও সকল রকম সাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আনাই এর মূল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, যদিও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলি দারিদ্র্য-দূরীকরণে এটিকে অন্যতম বিকল্প হিসাবেও মেনে নিয়েছে। কিন্তু এটি সাধন করতে গিয়ে যে বিপজ্জনক দুটি সমস্যা সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা স্পষ্ট করে ফেলেছি তা' আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনি। এই সমস্যা দুটির একটি হল প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্তি ও দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ও দূষণ। এর সঙ্গে আরো একটি সমস্যা যোগ করা যেতে পারে - উচ্চ প্রযুক্তির সাহায্যে নানা চাকুরী সৃষ্টি করা যাবে এইরকম একটি চিন্তা যা পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহাজ্য করেছে। সত্তরের দশকে গঠিত 'ক্লাব অফ্ রোম'-এর আশঙ্কাকে ঘনীভূত করে ২য় 'ব্র্যান্ড কমিশন' রিপোর্ট, যা' 'কমন ক্রাইশিশ্' নামেও পরিচিত, ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে জানালেন যে, "নগরকেন্দ্রিক শিল্পায়ন ও যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি এবং বর্তমান ভোগবাদ নতুন করে সৃষ্টি করা যাবে না এমন নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রাকতিক সম্পদগুলিকে শেষ করে এনে এমন এক পরিস্থতির সৃষ্টি করেছে যে যদি এর বিপরীত প্রক্রিয়া এখনই শুরু করা না যায় তবে সমগ্র মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।" আর পরিবেশ দূষণের মাত্রা এমন বেড়েছে যে মাত্র সামান্য একটি উদাহরণই আমাদের যথেষ্ট আতঙ্কিত করবে। 'শিউডোরূপ' (Pseudorupp) নামে একটি রোগ খুবই শিল্পোন্নত দেশে দেখা গেছে যাতে শ্বাসরোধের ফলে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে।

প্রকৃতির প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, যাকে বস্তুতান্ত্রিক বলাক যেতে পারে, তারই বহিঃপ্রকাশ এই ছবিটি। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রকৃতির ওপর কতৃত্বই মানুষের স্বাবাবিক অধিকার এবং একে সর্বতোভাবে জয় করাতেই তার আনন্দ। যত ভাবে কাজে লাগানো যাবে, যত সুযোগ তার থেকে গ্রহণ করা যাবে ততখানি সাচ্ছন্দ্য ও মুক্তি মানুষ লাভ করবে। অর্থাৎ অল্প কথায় প্রায় সংঘাতের একটি দৃষ্টিভঙ্গী। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের শুরুতে উক্ত মহাত্মা গান্ধীর এই কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে - "...এই আধুনিক সভ্যতা আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে যে একজনকে কেবল ধৈর্য ধরতে হবে ও এট

আত্মধ্বংসকারী হবে।" এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও একটি সাবধানবাণী আমরা স্মরণ করতে পারি - "সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি ও প্রকৃতির ওপর আমাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য আমদের সভ্যতার ওপরে গভীরভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে ও নানা ধরণের সামাজিক অনৈতিকতাও সৃষ্টি হয়েছে, যা বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব।"

এরই প্রায় বিপরীত ও অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী, যার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, তা হল প্রকৃতি সৃষ্টিরই অঙ্গ, সহযোগের ভিত্তিতেই, আত্মীয়তার বন্ধনেই মানুষ ও প্রকৃতি সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরকও, এবং মুক্তির অর্থ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, তাকে শোষণও নয়, বরং আমদেরই প্রয়োজনে তাকে সংরক্ষিত করতে হবে। উপনিষদের বাণী - 'যস্মিণ্ সর্বাণি ভুতানি আত্মৈভবৎ বিজাণত' - গান্ধীজী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ও সেইজন্য তিনি মনে করতেন যে এই জগতের উৎপত্তি কেবল বস্তুগত নয়। সেইজন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি গবেষণাকে ধন্যাবাদ জানিয়েছিলেন তিনি এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরে বিরাজিত আত্মা এক অবিনাশী পরমাত্মার অঙ্গ বলে তাঁর প্রত্যয় ছিল। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি - "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং -" ইত্যাদি, অর্থাৎ এই জগৎ, যার মধ্যে সব কিছুই রয়েছে, তা একই বস্তুর অঙ্গ, তাকে সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, লোভ করা উচিত নয় - এর অন্তর্নিহিত বাণী ছিল গান্ধীজীর আদর্শ ও জীবন-যাত্রার মূলভিত্তি এবং এরই প্রসারণ হিসাবে ১৯০৮ সালে লিখিত তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ' গ্রন্থে লিখলেন - "পৃথিবী প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনকে তৃপ্ত করার জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু তার লোভের জন্যে কোন ব্যবস্থাই রাখেনি।" এই উপলব্ধির গভীরতম যে তাৎপর্য প্রকৃতিকে সেইভাবেই দেখতে চেয়েছেন তিনি ও সেভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যই প্রকৃতি কোন সময়ে তাঁর শিক্ষক, কোন সময়ে আবার তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থারও অনুশীলিত চিকিৎসা-পদ্ধতির অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অংশ। তিনি লিখছেন - "অহিংসা ও প্রেমের পাঠ আমি প্রকৃতির কাছ থেকেই নিয়েছি।" বিবাদ-বিসম্বাদ মেটানোয় গান্ধীজী-স্পষ্ট পদ্ধতি সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তি ছিল এই মানবিক গুণ দুটি। ১৯৪৬ সালের ১৮ই মে সন্ধ্যাবেলা এক প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বললেন, "গাছ সারাদিন প্রখর সূর্যের তাপ সহ্য করে, কিন্তু শ্রান্ত পথিক, যে তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাকে শীতল ছায়া দান করে আর যারা তার দিকে পাথর ছোঁড়ে তাদের ফল দান করে সে উত্তর দেয়।" সহজীবন ও সমজীবনের তত্ত্বে আস্থাবান সর্বোদয় সমাজের রূপ প্রকৃতির রাজত্বে, তার সুশৃঙ্খল জীবন-ছন্দের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন গান্ধীজী, সংঘাতহীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সমর্থনও পেয়েছিলেন প্রকৃতির আচরণের মধ্যে থেকে।

প্রকৃতির নিয়মের এই পাঠকে বিভিন্ন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময়ে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯১০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন পূর্ণমাত্রায় চলছে তখন তাঁর সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকায় 'প্রকৃতি ও সভ্যতা' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধের মারফৎ প্রকৃতির আচরণের উদাহরণ দিয়ে তাঁর সহযোদ্ধা ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের সম্পদের প্রতি মোহ, ভোগবিলাস, মিথ্যা আচার-আচরণ ত্যাগ করে আন্দোলনে আরও গভীরভাবে নিয়িজিত হতে। সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে আহ্বান জানালেন গান্ধীজী। তিনি লিখলেন - "প্রকৃতি অবিরামভাবে তার কাজ করে চলে, মানুষ সব সময়ই তা লঙ্ঘন করে। প্রকৃতি নানাভাবে মানুষকে জানায় পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার পরিবর্তন হয় না, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।" যেমন কবি মালাবারী লিখেছেন - "তারা আসে যাবার জন্যেই, তবু যেমন প্যারী শহরের মানুষেরা বড় বড় প্রাসাদ বানাবেন, তা স্থায়ী হবে না তা তারা বুঝবেন না। কিন্তু আমরাও কি একই রকম ব্যবহার করব? প্রকৃতির এই নাটকের তাৎপর্য আমরা কিন্তু বুঝতে পারি এবং সেই জন্যে ট্রান্সভাল্ ও দক্ষিণ আফ্রকায় অবস্থিত ভারতীয়দের কাছে আহ্বান জানচ্ছি যে মিথ্যা ভোগবিলাস, মালাজপা পরিত্যাগ করে.....স্বৈরতান্ত্রিক আইন-কানুনে ভয় না পেয়ে, সত্যের প্রতি অবিচল থেকে অধার্মিক, অত্যাচারী সরকারের মোকাবিলা করুন। এটি সত্যিকারের ধর্মপালন হবে।"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করা গান্ধীজী পছন্দ করতেন না, তার ব্যতিক্রমও তিনি চাননি। তাই ভারতীয় মৃত্তিকার প্রকৃতি, তার পরম্পরা ভবিষ্যৎ সমাজ কল্পনায় গান্ধীচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে - যা হবে সব বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বশাসিত ক্ষুদ্র জনপদ, বিকেন্দ্রিত হবে যার সর্বপ্রকার কার্যক্রম। যেখানে উচ্চ-নীচ থাকবে না। শোষণের সুযোগ থাকবে না, এমনকি অন্যের প্রয়োজনে আত্মত্যাগেও যেখানে কেউ পিছপা হবে না। সঠিকভাবে লক্ষ্য করলে প্রকৃতির সমাজে এইটাই কি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না?

প্রকৃতির যে অনাবিল সৌন্দর্য তা কেবল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নয়, গান্ধীজীকেও গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রকৃতির ক্রোড়ে, সবুযের সমারোহে, স্নিগ্ধ মালিনীর তীরে সহজতম জীবন-যাপন অথচ উচ্চ চিন্তায় মগ্ন প্রাচীন ভারতীয় তপোবন-সমাজ হয়ত আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম, ওয়ার্ধার সেবাগ্রাম আশ্রম বা গান্ধী-স্থাপিত অন্য আশ্রমগুলির অন্যতম অনুপ্রেরণা হয়েছিল।

গান্ধীজী পরিকল্পিত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা (নঈ-তালিম) তার মধ্যে প্রকৃতির সাহচর্যের কথা বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যেই এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

প্রকৃতির উপাদানকে আরও একভাবে কাজে লাগিয়েছেন গান্ধীজী তাঁর অনুশীলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে যা 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি বলতেন এ হল প্রকৃতিগত উপায়ে স্বাস্থ্য ও আনন্দকে সুরক্ষিত করা। প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা ও অতিরিক্ত কিছু না করাই হল প্রকৃতিগত উপায়। আর যে পাঁচটি (৫টি) উপাদান দিয়ে তৈরী আমাদের দেহ মন - জল, বায়ু, মাটি, আকাশ ও আগুন - এদের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা রোগ নিরাময় করাই হল প্রাকৃতিক চিকিৎসার মূল কথা। পুণা শহরে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন তিনি যেখানে ১৯৩২ সালে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা"-র বিরুদ্ধে আমরণ অনশনে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বকণ্ঠে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়...' গানটি গান্ধীজীকে শুনিয়ে ছিলেন।

প্রকৃতি কি তার এই বন্ধুটিকে কোন স্বীকৃতি দেয়নি? একবার সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে এসেছেন গান্ধীজী। যেন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেই অসময়ে একটা গাছে ফুল ফুটে উঠলো। সেই সময়ের আশ্রমবাসী বলরাম বর্মা বি. বি. সি.-র সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়েছিলেন মহাত্মাজীর মৃত্যুর পরে যখন ব্রিটিশ ব্রড্‌কাস্টিং তাঁদের 'টকিং এবাউট্ গান্ধী' বইটি প্রকাশ করেন।